বিপন্ন জনপদ বিষণ্ন মানুষ

এক \ বিশ্ব উষ্ণায়ণ ও বাংলাদেশ

ডিজিটাল লাইফ কলামে (দৈনিক যুগান্তরের) আমি এ পর্যন্ত আমাদের জীবনে একেবারে সরাসরি জড়িত তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়েই লিখেছি। একথা সত্য যে, ডিজিটাল লাইফস্টাইলে আইসিটিই মূখ্য উপজীব্য বিষয়। কিন্তু আমাদের এই জীবনে আরো অনেক সমস্যা আছে যা ডিজিটাল লাইফ থেকে দূরে নয়। বিশেষ করে একুশ শতকের জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গঠনে জীবন-জীবিকা ও পরিবেশ বিপর্যয় সংক্রান্ত ব্যাপারগুলোর গুরুত্ব অপরিসীম। আজ আমরা তেমনি একটি বিষয় নিয়ে লিখবো, যার সাথে এদেশের প্রায় পৌনে এক কোটি সাধারণ মানুষ ও দেশের এক দশমাংশ অঞ্চলের অস্তিত্বের প্রশ্ন জড়িত।

গত ৬-৭-৮ জুলাই ২০05 স্কটল্যান্ডের গ্লেনিগেলসে বিশ্বের উন্নত ৮টি দেশের যে জি-৮ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে তাতে অনেক বিষয়ের মাঝে বিশ্ব উষ্ণায়ণ একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয় ছিলো। উন্নত দেশগুলোর সৃষ্ট এই মহাবিপদ আমাদের মতো অনুন্নত দেশগুলোর ভবিষ্যতই বিপন্ন করে ফেলেছে। কিন্তু জি-৮ নেতারা এক্ষেত্রে কার্যকর কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি। এর ফলে আমেরিকার পাপের শাস্তি পাচ্ছি আমরা, বাংলাদেশের মতো তৃতীয় বিশ্বের নিরীহ মানুষেরা। তারা ওজন স্তরে ক্ষতি করার জন্য মহাকাশে গ্যাস ছড়াচ্ছে আর তার খেসারত দিচ্ছি আমরা।

কার্যত বিশ্বের সিংহভাগ সম্পদ ভোগকারী উন্নত দেশগুলো শত শত বছর জুড়ে বিশ্বের প্রাকৃতিক ভারসাম্য যেভাবে নষ্ট করেছে তারই কুফল সারা পৃথিবীতে এখন প্রবল রূপ নিয়েছে। খরা, বন্যা, মরুকরণ, ঝড়-ঝঞ্ঝা ও অভাবিত দুর্যোগ এরই মাঝে সারা দুনিয়াকে তছনছ করে দিচ্ছে। বাংলাদেশ এই মনুষ্য সৃষ্ট বিপদের এক নিদারুণ ভুক্তভোগী। এর মাঝেও বাংলাদেশের হাওর অঞ্চল নামক একটি জনপদ আরো বেশি বিপন্ন এবং সে কারণেই এই অঞ্চলের মানুষেরাও বিপন্ন।

এই অঞ্চলে বিশ্ব উষ্ণায়ণ শুধু সমস্যা হিসেবে আসছেনা-সেই এলাকাটিই প্রায় বিলীন হয়ে যেতে পারে এই সমস্যায়। আজ আমরা সেই অঞ্চলটি নিয়েই লিখবো। ঘটনাচক্রে এই অঞ্চলটি আমার পিতৃভূমি।

দুই \ হাওর জনপদ ও বিশ্ব উষ্ণায়ণ

বাংলাদেশটা পুরোটাই বলতে গেলে জলাশয়। গারো পাহাড়ের নিম্নাঞ্চলে গঙ্গা-ব্রক্ষ্মপুত্র-যমুনা ও বরাকের নিম্নাংশে অবস্থিত বলে দেশটিকে তার আকৃতির তুলনায় বহুগুণ বেশী জল বহন করতে হয়। একে যথার্থই বলা হয় গাঙ্গেয়

নিম্নাঞ্চল। খাল-বিল-নদী-পুকুর বা ছোটখাটো খানা-খন্দক-জলাশয়ে পুরো দেশটাই ভরে আছে। আবার অপেক্ষাকৃত উচু ভূমির মাঝখানে চলন বিলের মতো বিশাল জলাশয় আছে এদেশে। তবে আমরা এই জলমগ্ন দেশটিরই অধিকতর নিম্নাঞ্চল অথবা এক বিপন্ন অঞ্চলের প্রতি পুরো দেশের মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারি- সহজ কথায় এই অঞ্চলকে হাওর অঞ্চল বলে। হাওর শব্দটি সাগর শব্দের অপভ্রংশ। ফলে হাওর বলতে যে সাগরকেই বোঝানো হয় তাতে কোন সন্দেহ নেই। তবে প্রশ্ন হচ্ছে দেশের ভেতরে এই সাগর কেমন দেখতে।

ভৈরব সেতুর উজানে দেশের ৭টি জেলার অংশবিশেষ সমন্বয়ে বিস্তৃত এই অঞ্চলের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নিয়ে সরকারী-বেসরকারী মহল কি ভাবছেন, তা আমি জানিনা। কিন্তু ঐ অঞ্চলের কোটি মানুষের জীবন যে বিপন্ন তা সেখানে বসবাসকারী প্রতিটি মানুষই অন্তরের টানেই জানে।

অবশ্য এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, বিশ্ব উষ্ণায়নের ফলে এর চাইতেও বিপন্ন জনপদ হচ্ছে সাগর তীরবর্তী সুন্দরবন এবং খুলনা ও বরিশাল বিভাগের উপকূলাঞ্চল। তবে হাওর অঞ্চলের সমস্যাটি আরো বহুমাত্রিক।

এই অঞ্চলের মানুষের প্রথম অসুবিধাটি হচ্ছে এখানকার মানুষের জীবনযাপন ভূ-প্রাকৃতিক পরিবেশ, পুরো দেশটির সাথে মিলেনা। ফলে রাজধানী ঢাকায় বা জেলা শহরে বসে যারা দেশের সমস্যা সমাধান করেন বা উন্নয়ন পরিকল্পনা করেন সেইসব ভাগ্যবিধাতারাও এই অঞ্চলের মানুষের সুখ-দুঃখের কাব্যের একটি পংক্তিও জানেন না। কিশোরগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, সিলেট সদর, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার, সুনামগঞ্জ বা নেত্রকোণা নামক যে ৭টি জেলায় এই হাওর অঞ্চল অবস্থিত তার মধ্যে কেবলমাত্র সুনামগঞ্জ জেলা সদরটি হাওরের কাছাকাছি বা পাড়ে অবস্থিত। ব্রাহ্মণবাড়িয়া বা সিলেট সদর থেকে কয়েক পা এগুলেও হাওর দেখা যায়। তবে কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোণা বা হবিগঞ্জ জেলা সদরে বসে আন্দাজই করা যায়না, প্রকৃত হাওর অঞ্চল দেখতে কেমন। সুতরাং যেসব কর্মকর্তা জেলা সদরের বাইরে পা ফেলেন না, তারা ধারণাও করতে পারেন না যে, হাওর অঞ্চলের মানুষ কিভাবে জীবনযাপন করে। বিশেষ করে এই একুশ শতকে, চারপাশে যখন ডিজিটাল লাইফ বাড়-বাড়ন্ত, তখন হাওরের মানুষের কথা ভাবনাতেই আসছেনা। তবে শুধুমাত্র সরকারী কর্মকর্তাদের কথা বলেই কি লাভ? এই হাওর অঞ্চলে যেসব মহান রাজনীতিবিদদের জন্ম হয়েছে তারাও কি তাদের রাজনৈতিক জীবনে এই অঞ্চলের সমস্যা সমাধান বা উন্নয়নের জন্য তেমনভাবে ভেবেছেন, যেমনটি তাদের ভাবা উচিৎ ছিলো?

স্বদেশ স্বকাল

বর্তমান স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী হাওর অঞ্চলের একটি সংসদীয় আসনকে প্রতিনিধিত্ব করেন। এবার তার দলেরই চারদিকে জয়জয়কার। তার দল দীর্ঘ সময় ধরে ক্ষমতায় রয়েছে। এরশাদ আমলেও অনেক ভুঁইভোড় নেতা এই এলাকাকে প্রতিনিধিত্ব করেছেন। তবুও হাওর অঞ্চলের আকাঙ্ক্ষিত উন্নতি হয়নি।

বরং বিগত সরকারের আমলে হাওর অঞ্চলের গ্রামগুলো রক্ষা, হাওরের ফসল সংরক্ষণ, নদী ভাঙ্গন ইত্যাদি খাতের প্রকল্পগুলো বর্তমান সরকার বাতিল হয়েছে। হাওরের পাড় দিয়ে মোহনগঞ্জ-ধর্মপাশা-সুনামগঞ্জ সড়ক নির্মাণ পর্যন্ত বন্ধ রয়েছে। নেত্রকোণা জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী এ বিষয়ে হাত গুটিয়ে বসে আছেন বলেই মনে হচ্ছে। এমনকি সিলেট থেকে নির্বাচিত অর্থমন্ত্রীও হাওর অঞ্চলের জন্য নীরব।

এই এলাকার অনুন্নয়নের একটি কারণ হয়তো এই যে, এই এলাকার যারা প্রধান রাজনীতিবিদ তারা জীবনের বেশীরভাগ সময় বিরোধীদলেই কাটিয়েছেন। এই এলাকার বিরোধীদলীয় রাজনীতিকদের তালিকায় আছেন মরহুম আব্দুস সামাদ আজাদ, সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত, মরহুম আব্দুল মমিন, বিরোধী দলীয় উপনেতা আব্দুল হামিদ, জিল্লুর রহমান, মরহুম শাহ এ.এস.এম কিবরিয়া প্রমুখ। তারা দেশের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার শীর্ষে অবস্থান করেছেন স্বল্প সময়ের জন্য। ঐতিহ্যগতভাবে প্রগতিশীল রাজনীতিতে ঝুকে পড়া এই অঞ্চলের মানুষ বরাবরই অসাম্প্রদায়িক, প্রগতিশীল রাজনীতির সহচর। একাত্তরে এই এলাকাটি মুক্তাঞ্চল ছিলো। ফলে প্রগতিশীল রাজনৈতিক নেতারাই কার্যত এই এলাকার রাজনৈতিক কর্ণধার। তাদের আমলে এই এলাকায় উন্নয়ন হয়নি তা নয়। বাংলাদেশ সবাধীন হবার পর বঙ্গবন্ধু হাওর উন্নয়ন বোর্ড গঠন করে এই অঞ্চলের উন্নয়নে এক নতুন দিগন্তের সূচনা করেছিলেন। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুর পর এদেশের সৈবরশাসক বা তথাকথিত গণতন্ত্রী শাসকগণ ১৯৯৬ পর্যন্ত হাওর উন্নয়নের বিধিবদ্ধ সেই সংস্থাটিকে অকার্যকর করে রাখেন। পরে শেখ হাসিনার সরকার ঐ বোর্ডটিকে পুনরুজ্জীবিত করেন। কিন্তু **হাওর উন্নয়ন বোর্ড** বা অন্য কোন সংস্থাই গ্লোবাল ওয়ার্মিং বা বিশ্ব উষ্ণায়ণের ফলে হাওর জনপদের জীবন কিভাবে বিপন্ন হবে- সেই বিষয়ে কোন উদ্বেগও প্রকাশ করেনি।

আমি আসলে নিশ্চিত নই যে, ঐ এলাকার মানুষ, জন প্রতিনিধি, প্রশাসন, বেসরকারী সংস্থা বা সরকার আদৌ উপলব্ধি করেন কিনা যে, বিশ্ব উষ্ণায়ণের ফলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা যদি মাত্র তিন ফুট বেড়ে যায়, তবে এই অঞ্চলের জীবনযাত্রা কেমন হবে? এই অঞ্চলে আদৌ মানুষ নামক কোন প্রাণী বসবাস করতে পারবে কিনা বা তাদের জীবনযাপনের প্রয়োজনীয় উপকরণ এই অঞ্চলে আর পাওয়া যাবে কিনা, সে বিষয়েও কেউ সচেতন কিনা-আমি জানিনা। আমার মনে আছে,

স্বদেশ স্বকাল

হাওর অঞ্চলের অবস্থা বিশ্ব উষ্ণায়ণের ফলে কি হতে পারে তার একটি চিত্র আমি আমার সম্পাদিত পত্রিকা **আনন্দপত্রে** তুলে ধরেছিলাম ১৪ বছর আগে। বিশ্বের অন্যতম সেরা সাপ্তাহিক সাময়িকী ফার **ইস্টার্ন ইকনোমিক রিভিউতে** প্রকাশিত এক নিবন্ধে উল্লেখ করা হয়েছিলো যে গ্লোবাল ওয়ার্মিং-এর ফলে বাংলাদেশের এক তৃতীয়াংশ অঞ্চল তলিয়ে যাবে। দেশের দক্ষিণের উপকূলাঞ্চল ছাড়াও মেঘনা তীরবর্তী দুই কূল এবং পুরো হাওর অঞ্চল ছিলো সেই তলিয়ে যাবার মানচিত্রে। আমাদের সেই আশংকার চিত্রটি এখন বাস্তবে পরিণত হতে শুরু করেছে। বস্তুত হাওরের প্রাকৃতিক ভারসাম্য এখন বিপর্যয়ের মুখে। ছোট ছোট জলাশয়-বিলগুলো গারো পাহাড় থেকে ছুটে আসা বালিতে ভরে যাচ্ছে। কোন কোন হাওর পুরোটাই বালির স্তূপে পরিণত হয়েছে। ঐসব এলাকায় এখন মাছও নেই, ফসলও নেই। নদীগুলো ভরাট হয়ে গেছে। বিলগুলোও ভরাট হয়ে পড়েছে। এক সময়কার মৎস্যভান্ডার এখন বলতে গেলে মৎস্য শূন্য। কিন্তু যে বিপদটি এখন অতি দ্রুত বিশাল সমস্যায় পরিণত হয়েছে সেটি হচ্ছে এক ফসলী এই অঞ্চলের অনেক জমি এখন চাষের আওতায় থাকছেনা। অনেক জমি থেকে হেমন্তকালে পানি সরেনা। ফলে সেইসব জমিতে ধান চাষ করা যায়না। আবার এখন প্রায় প্রতি বছরই সময়ের আগেই প্লাবনের পানি আসছে। ফলে এমনকি যে সব জমিতে ধান চাষ করা যায় সেগুলোও ধান পাকার আগেই বন্যার পানিতে ডুবে যাচ্ছে।

বিগত ৪ বছর পর এবার বিলম্বিত বর্ষা ও বিলম্বিত বন্যার কারণে হাওর এলাকার মানুষ শতকরা ৮০ ভাগ জমির ধান কাটতে পেরেছে। তবে এবারও অকাল বন্যার চাপ পড়েছিলো। অনেক এলাকাতে সরকারী দলের তস্করদের হাতে লুটপাট হওয়া বাধের টাকার বদলে জনগণের স্বেচ্ছাশ্রমে হাওর অঞ্চলের কৃষকের ফসল এবার রক্ষা পায়। কিন্তু তারপরেও শতকরা ২০ ভাগ জমিতে সেই যে পানি আসে তা আর সরেনি। বিশেষজ্ঞদের মতে হাওর এলাকার শতকরা ১০ ভাগ জমিতে এখন চাষাবাদই হয়না। আমার নিজের বাড়ী হাওরে। আমি শৈশবে যেসব জমিতে চৈত্র মাসে চৌচির ফাটা দেখেছি এখন চৈত্র মাসেও তাতে পানি জমে থাকে। আমাদের পৈত্রিক সম্পত্তির শতকরা ১০ ভাগ অনাবাদী হয়ে পড়েছে।

আমি নিশ্চিত যে, এইসব ঘটনা বিশ্ব উষ্ণায়ণের ফলেই ঘটছে।

পাহাড়ে ভূমিধ্বসে বালি নেমে আসছে। সেই বালিতে ভরে যাচ্ছে জমি। আবার হাওরের সুরমা, কুশিয়ারা, কালনী, ভেড়ামোহনা, বৌলাই, ঘোড়াউত্রা, নরসুন্দা- এমনকি ধনু নদী পর্যন্ত নাব্যতা হারিয়েছে। এসবের অনেকগুলো নদী এখন মরুভূমি হয়ে পড়েছে। কোন কোন নদীর চিহ্ন পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া যাচ্ছেনা। এমনকি অনেকেই এটিও মনে করছেন যে, নদীর পানির লবণাক্ততাও বেড়ে

গেছে। সমুদ্রপৃষ্ঠ যদি তিনফুট উচু হয় তবে হাওর অঞ্চলের শতকরা ৯০ ভাগ জমি সারা বছরই পানির তলে থাকবে। আবার এইসব জমিতে মিষ্টি পানির মাছও থাকবেনা। লবণাক্ততার জন্য জমিতে ফসল হবেনা-মিষ্টি পানির মাছও পাওয়া যাবেনা।

বাংলাদেশের ভূ-প্রাকৃতিক গঠনের মানচিত্র অনুসারে এই অঞ্চল ১০ থেকে ২০ ফুট উচ্চতায় রয়েছে। তবে প্রকৃত পক্ষে ২০ ফুট উচ্চতাও কার্যকর থাকবেনা- যেহেতু ভারতসহ বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের পানি বহন করার ক্ষমতা নদীগুলোর নেই। এছাড়া টিপাইমুখ বাধ হাওরের জন্য আরো নতুন নতুন সমস্যার জন্ম দেবে। ২০১২ নাগাদ ভারত এই বাধটি চালু করবে বলে জানা গেছে।

হয়তো শুধু বসবাসের গ্রাম বা উঁচু কান্দাগুলো হেমন্ত জেগে থাকবে- জমিগুলো থাকবে লবণাক্ত পানির নীচে।

আমি ভাবতেও পারিনা, দেশের এক দশমাংশ এই অঞ্চলের এক ফসলী জমিতে চাষকারী কৃষক তথা আমাদের পরিবার পরিজন-আত্মীয়সবজন কেমন করে, কি কাজ করে বেঁচে থাকবে।

এমনিতেই প্রতি বর্ষাকালে পুরো হাওর অঞ্চলের মানুষের কোন কাজ থাকেনা। বোরো মৌসুমে তারা যা উপার্জন করে তাই দিয়ে সারা বছর চলে। যে বছর ধান তলিয়ে যায় বা শিলাবৃষ্টিতে নষ্ট হয় সে বছর নীরব দুর্ভিক্ষ চলতে থাকে।

যদি এমন অবস্থায় গোদের উপর বিষফোড়া হিসেবে বিশ্ব উষ্ণায়ণ হাওর জনপদকে আরো বিপন্ন করতে থাকে, তবে কোন এক সময়েই বাংলাদেশের এই অঞ্চলে কোন মানুষ বসবাস করবে কিনা আশংকা থাকছে। বস্তুত সমুদ্রেতো মানুষ ঘরবাড়ী বেধে থাকতে পারেনা। তাই তখন হাওরকে আমরা সাগরই বলবো। বাংলাদেশের উপকূলের বঙ্গোপসাগর দেশের ভেতরেই প্রবেশ করবে।

যদি আমাদের মহান রাজনীতিবিদ, নীতিনির্ধারক, আমলা-বেসরকারী সংস্থা তথা হাওর অঞ্চলের জনগণ এ বিষয়ে সচেতন না হন, তবে ইতিহাসে একদিন লেখা হবে হাওর অঞ্চলে সামুদ্রিক প্রাণী বসবাসের আগে মানুষ নামক এক ধরনের দ্বিপদ প্রাণী বসবাস করতো।

২৫ জুলাই ২০০৫\ ২৭ জুলাই ২০০৫ দৈনিক যুগান্তরে প্রকাশিত॥ ০৬ ফেব্রুয়ারি ০৬ সম্পাদিত